Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সেলিম আল দীন রচিত *কিত্তনখোলা*: আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত রূপান্তরের রেখাচিত্র

আয়েশা সিদ্দিকা*[১]

সার-সংক্ষেপ

জীবন যাপনের বাঁকে নানা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয় মানুষ। বিচিত্র জীবনবাস্তবতার পরতে পরতে সংগ্রাম, শোষণ, সংস্কার, বিশ্বাস, হতাশা আর ভালোবাসার মতো নানারঙের সুখ-দুখের দোলাচলে গন্তব্যের দিকে ধাবমান এক একটি মানব জীবন। মাতৃজঠর থেকে পৃথিবীতে এসে সবাই মৃত্যুর দেখা পায় তবুও একেক জনের জন্ম-মৃত্যু একেক রকম। একটা জীবনে মানুষ কত জীবন যাপন করে-এই প্রশ্নটা সেলিম আল দীন রচিত কিত্তনখোলা নাটকে ঘুরে ফিরে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। নাট্যকার এই নাটকে একজনমের নানা রূপান্তরের অদৃশ্য বাস্তবতা উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন সোনাই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। এরই সমান্তরালে উঠে এসেছে যাত্রাদলের বনশ্রী বালা, রবি দাশ ও ছায়া রঞ্জন, লাউয়া নারী ডালিমন ও রুস্তম, কলু বছির, চালের ব্যবসায়ী গোলাপ গাছি, ইদু কনট্রাক্টর। সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের এক দীপ্র নক্ষত্র। ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তিনি স্বভূমির ঐতিহ্যকে ধারণ করে নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র নাট্যধারা। বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে প্রচলিত সংলাপের সীমায় সাধারণ মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে বাঁধা যায় না বলে তিনি তাঁর শিল্পকর্মে সংলাপের পাশাপাশি বর্ণনা, সংলাপের সঙ্গে নৃত্য-গীত যুক্ত করেছেন। তার অন্যতম উদাহরণ কিত্তনখোলা। গ্রামবাংলার চিরায়ত এক মেলাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের পট উন্মোচিত হয়েছে। মেলায় আসা মানুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি পেশাগত রূপান্তর এই নাটকের মৌল উপজীব্য। আসলে এক জীবনে নানা রূপান্তরের সাক্ষী মানুষ। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার উন্মোচন করেছেন এক গূঢ় বাস্তবতা- তা হলো সমগ্র জীবজগতের ভেতরেই চলছে এক গোপন ভাঙ্গা-গড়া। সৃষ্টি পরবর্তী পৃথিবীতে জীব ও জগতের জীবনচক্র ক্রমরূপান্তরিত পদ্ধতিতেই এগিয়ে চলেছে। মানবজীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরে বেঁচে থাকার তাগিদে পেশাগত রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই রূপ বদলটায় সত্যি। প্রকৃতিগত রূপান্তরের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত রূপান্তরটা সেলিম আল দীনের কিত্তনখোলা নাটকে কতটা প্রযুক্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণই বক্ষমাণ প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

নাট্যকার সেলিম আল দীন বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিকের সঙ্গে স্বকীয় নাট্যপ্রতিভার সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব নাট্যভুবন। বলা যায় তিনি আখ্যান বর্ণনায় হাজার বছরের বাংলা পাঁচালীরীতির মূল কাঠামোকে ঠিক রেখে তার সঙ্গে প্রযুক্ত করেছেন সমকালীন যুগযন্ত্রণা, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বসভ্যতায় মানবিকতার বিপর্যয় ও উচ্চাঙ্গের জীবনবোধসম্পন্ন দার্শনিক মূল্যবোধ। বর্ণনা ও সংলাপের সঙ্গে বাদ্য, নৃত্য, গীতের সম্মিলনে তিনি নির্মাণ করেছেন নতুন এক নাট্যনন্দনশিল্পকর্ম। নাট্য রচনার শুরুর দিকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত ধারায়

[১] সহকারী অধ্যাপক, ভাষা যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
* Corresponding Authors email: ayashasiddika.bangla@gmail.com. Phone: +8801712550577.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

নাটক লিখলেও *কিত্তনখোলাতে* সেলিম আল দীন বর্ণনাত্মক স্বদেশীয় নাট্যউপাদানের সঙ্গে জনপদের মানুষ, বাংলার বিস্তৃত পরিমন্ডল ও নিজস্ব সংস্কৃতির এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। নাট্যকার নিজেই উল্লেখ করেছেন, "*কিত্তনখোলা* থেকে আমার ভাবনা, রচনারীতি খানিকটা হলেও স্বাবলম্বিতার পথ খুঁজে পেয়েছিল–.. ..এ নাটকের মধ্যে দিয়েই ঔপনিবেশীয় কালের নাট্যগড়ন ভাঙবার চেষ্টা করেছি।"[২] *কিত্তনখোলা* নাটকটির রচনা ১৯৭৮-৮০ সালের কাল পরিসরে। এক জনমে নানা রূপান্তরের সাক্ষী মানুষ। প্রতিটি মানুষই জীবন যাপনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবমান। *কিত্তনখোলা* নাটকে গোলাপ গাছি, সোনাই, বনশ্রী, ছায়ারঞ্জন, ডালিমন, রুস্তম, ইদু কনট্রাক্টরের মতো চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে এক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত রূপান্তরের অদৃশ্য এক নির্মম বাস্তবতা।

বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে রচিত *কিত্তনখোলা* নয়টি সর্গে বিভাজিত। "সর্গ শব্দটি দ্বারা মূল চরিত্র সোনাইর ক্রমপরিণতির ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা ছিল।"[৩] বৃহৎ পটভূমি, ঘটনাবহুলতা, গল্পের খাঁজে খাঁজে গল্প, সমাজের নানা স্তরের মানুষ ও তাদের নানা বর্ণের সংস্কৃতি–সব মিলিয়ে এই নাটকে রয়েছে মহাকাব্যিক বিস্তার। নাটকটিতে ঢাকার দক্ষিণ দিকের জেলা মানিকগঞ্জের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও টাঙ্গাইল জেলার কিছুটা নিয়ে যমুনা নদীর পূর্বপাড়ের কোল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনপদের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে লৌহজং নদীর পশ্চিম তীরে কিত্তনখোলা গ্রামে গড়ে ওঠে মনাই বয়াতির মাজার। মনাই বাবা মারা যাবার দু'বছর আগে থেকে সেখানে প্রতি বছর মাঘমাসের পূর্ণিমায় তিনদিনের মেলা বসে। এই মেলাটি বাংলাদেশের যে-কোনো মেলা হতে পারে। সামাজিক বিনিময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান মেলা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রামীণ লোকায়ত জীবন, গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মানুষগুলোর নানা তুকতাক এমনকি 'কামরূপ কামাইখ্যা'র অতিলৌকিক চিকিৎসাপদ্ধতি সব মিলেমিশে নাটকে এক বিরাট ক্যানভাস তৈরি হয়েছে। এখানে নাটকের মহাকাব্যিক বিস্তারে নাট্যকার দেখিয়েছেন জীবজগতের ভেতরে চলছে এক গোপন ভাঙ্গা গড়া। নাট্যকারের ভাষায়, "রূপান্তরকে আমরা এই নাটকে আবহমানকালের বাংলায় সর্বগ্রাসী বিষয় হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি।"[৪] তিনি এই সপ্রসঙ্গে "বৌদ্ধ জাতকের গল্পে কি জ্বীনপরীর গল্পে রূপান্তর একটি Frequent (ফ্রিকোয়েন্ট) ব্যাপার। ওভিদের মেটামরফসিস কাব্যে এই রূপান্তর র‍্যাডিক্যাল"[৫] বলে উল্লেখ করেছেন। আঙ্গিক ও বিষয়ের রূপান্তরের সঙ্গে এই নাটকে মানব-চরিত্রের রূপান্তরের দিকেও অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়েছেন নাট্যকার। সত্যিকার অর্থে আমাদের খাটুনি বেচা সাধারণ মানুষগুলো অস্তিত্বের লড়ায়ে টিকে থাকতে ক্রমাগত জীবিকার বদল করে চলেছে। অর্থনৈতিক চাপে ঘটে চলে পেশাগত রূপান্তর। নাটকের শুরুতেই এক পৌঢ়ের চালের ব্যবসা ছেড়ে গাছি হয়ে রস ও গুড়ের কারবার করার প্রসঙ্গে ছগিবুড়ির

[২] সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ২, সংকলন সাইমন জাকারিয়া, মওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৬, পৃ. ভূমিকা
[৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
[৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
[৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

কেচ্ছার কথা নাট্যকার কৌশলে যুক্ত করেছেন, "জ্বীনের রাজায় মানুষেরে পাথর বানাইত–পাথর থিক্যা গাছ– গাছ থিক্যা ফল–ফল থিক্যা পঙ্খী– ।"[৬]

তালুকনগরে মনাই বাপের মেলাকে কেন্দ্র করে *কিত্তনখোলা* নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। মেলাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা নানা রঙের, নানা পেশার, নানা মেজাজের মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটে। কেউ আসে গুড়ের ঠিলা, তাড়ির হাড়ি, কাঠের আসবাসপত্র, বায়োস্কোপ, খেলনা ও মুখোশের পসরা নিয়ে, কেউবা এসে তাড়ি খায়-জুয়া খেলে, কেউ আসে যাত্রা, কবিগানের আসর জমাতে, কেউ কেউ কবিরাজি চিকিৎসা নেয়- কেউ নেয় তাবিজ-ছাড়-ফুঁক, অনেকেই আবার সংসারের টুকিটাকি প্রয়োজনীয় সদাইপাতি করে আর কেউ কেউ আসে মেলা দেখতে। টুইটাম গ্রামের এক খেটে খাওয়া দিনমজুর সোনাই তার সঙ্গী কলু বছিরকে নিয়ে মেলা দেখতে আসে। উত্তরাধিকারসূত্রে সে চার বিঘা জমি পেয়েছিল। তার কিছু অংশ ইদু কন্ট্রাক্টরের কাছে বন্ধক আছে। ইদু অল্প কিছু টাকা দিয়ে জমি পুরোপুরি নিয়ে নিতে চায়। সোনাই ও তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা রাজি হয় না। আবার চার হাজার টাকা শোধ করে বন্ধকী জমি ছাড়ানোর সাধ্যও তার নেই। বছর দুই আগে তার বউ চম্পা মৃত সন্তান প্রসব করে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায়। মেলা কমিটির মেম্বার ইদু চায় মেলাতে যে ভাবেই হোক সোনাইকে কিছু টাকা গছিয়ে দিয়ে জমিটার সাফকবলা করে নিতে। শেষ সম্বলটুকু কোনোভাবে যদি ইদু লিখে নেয় এই ভেবে মেলার মধ্যেও সোনাই খুবই ভীত থাকে। মেলাতে তাই সে ইদুকে এড়িয়ে চলে। বছির সবসময় সোনাইয়ের সঙ্গে থাকে, মনাই বয়াতির মাজারে সোনাইর জন্য দোয়া চায়। ইদুর কথা মতো সোনাই জমি দিতে রাজি না হওয়ায় ইদু অন্যপথ ধরে। তার লোকেরা সোনাইয়ের তিনকুড়ি দশ টাকার থলেটা কৌশলে নিয়ে যায়। সোনাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে। মালেক থলেটা ফেরত দিয়ে ভালোমানুষ সাজে। তারপর সে তার নিজের টাকায় সোনাইকে তাড়ি খাওয়ায় এবং জুয়া খেলতে উৎসাহ দেয়। নেশার ঘোর কেটে গেলে সোনাই জুয়া খেলতে অস্বীকৃতি জানাই। মালেক তখন তার টাকা ফেরত চায়। সোনাই এক পর্যায়ে বুঝতে পারে ইদু মালেককে দিয়ে তার সর্বনাশ করেছে। প্রতিশোধের পথ খোঁজে সোনাই। সর্বস্বান্ত হয়ে সোনাইয়ের মনে হয় "অখন তো আমার কিছুই নাই। সামনে কি আছে জানি না–কিন্তুক কিছু একটা আছে। সেইটা কি–কেমনতরো বাঁচন হবে খোদা।"[৭] নাটকের শেষ ভাগে ইদু কন্ট্রাক্টরকে খুন করে সোনাই। আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র সোনাইকে আরেক রূপান্তরের দিকে ঠেলে দেয়। সে পেশাগত রূপান্তরের অনিবার্য বাস্তবতায় শেষ পর্যন্ত রুস্তমের সঙ্গে দুখাইপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সাপ ধরা, বিষ নামানোর মন্ত্র শিখে নতুন কোনো জীবন হয়ত সেই বিন্দুতে শুরু করার অর্নিণিত স্বপ্ন নিয়েই তাদের এই যাত্রা। এই দুখাইপুর যে ঠিক কোন স্থান তা কিন্তু নাট্যকার নাটকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি। হয়ত এক বুক দুঃখ নিয়ে সেখানে সোনাই বা রুস্তমদের মতো ভেসে চলা মানুষেরা আশ্রয় পায়।

[৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
[৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

নাটকের শরীর জুড়েই মৃগীরোগী সোনাইর হাহাকার মিশে রয়েছে–"এক জনমে কত বদল কত টেক"।[৮] কালের বিবর্তনে রূপের পরিবর্তনটায় সত্যি। অর্থনৈতিক শোষণ, ভিন্নমুখী অত্যাচার, শ্রেণিবৈষম্য ও দমন-পীড়ন পেশাগত রূপান্তরকে অনিবার্য করে তোলে। এই নাটকে সোনাই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, "দাদার বাপে নুরুদ্দীন আছিল জোলা-পাবনার কৈজুরী গেরামে। তাঁতে আগুন লাগায়া আসছিল টুইটামে। দাদার নাম রইসুদ্দি–চাষের কাম করত। বাপ আজলদ্দি–আমার নাম সোনাই–গতর খাটি–দিনমজুর।"[৯] ছোটবেলায় বাবাহারা সোনাইয়ের জীবনেও একদিন স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ ছিলো। তখন সোনাইয়ের বউ চম্পা বেঁচে ছিলো। সারাদিন চাষবাসের কাজ শেষে উঠোনে বসে সে পুথি পড়তো আর চম্পা শুনতো। বউটা মারা যাবার পর অবস্থান্তরে দিনমজুরে রূপান্তরিত হয়ে নতুন জীবনসংগ্রাম শুরু হয়েছে তার। একদিকে জমি হারিয়ে নিঃস্ব হবার যন্ত্রণা অন্যদিকে ঘরের ভেতর মৃত বউটার গন্ধ জড়ানো কাঁথা-কাপড়। নাটকের শেষে এই দিনমজুর সোনাইয়েরই আরেক রূপান্তর ঘটে সাপুড়ে হিসেবে। আবার পূর্বপুরুষের তেল ভাঙানোর ঘানি থেকে বছিরেরও সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আবার ঘানির গরুটা মারা গিয়ে তাকে আরো বিপদে ফেলেছে। সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তাই ঘানির তেলের বদলে ভাদ্রার হাটের তেলের মেশিনের দিকে সবার মনোযোগ। স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র আয়ের পথ বছিরের বন্ধ হবার পথে। নাটকে দেখা যায় বছির যাত্রা বা কবিগানের আসরে খোল বাজায়। এটা তার নেশা। কিন্তু খোল বাজিয়ে আর তেলের ঘানি টেনে সংসারের অভাব ঘোচে না তাই যন্ত্রণা ভুলতে তাড়ি খায়। যান্ত্রিকতার এই যুগে স্বদেশীয় অনেক ক্ষুদ্র পেশাই বিলুপ্তির পথে। অধুনালুপ্ত সেসব পেশার মানুষগুলো পরিবারসহ বাঁচার তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন পেশাকে আঁকড়ে ধরেছে। ঠিক এমনই পেশা বদলের তথ্য পাওয়া যায় শামছল বয়াতীর বয়ানে। তার বড় ছেলেও ঘর-গেরোস্থালির কাজ ফেলে চাকরি করতে ঢাকায় গিয়েছে। এরই সমান্তরালে *কিত্তনখোলা*তে খালেক মাঝির পেশাগত রূপান্তরের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগরের কূলের নোনা অঞ্চলে জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত হাজারো মানুষের প্রতিনিধি খালেক। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অনেকদিন আগে সে এসে উপস্থিত হয়েছিল মানিকগঞ্জে। কালীগঙ্গা নদীর তীরের এক হোটেলে প্রথমে কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে নদীতে ব্রীজ হলে হোটেল বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সেই হোটেলের কর্মচারীই কালীগঙ্গা নদীর খালেক মাঝিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সীমিত উৎপাদনের পাশাপাশি শ্রেণি শোষণ সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্তই করেছে। এদেশীয় সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রধান পেশা যেমন–সরকারী-বেসরকারী চাকরীজীবী, কৃষক, ব্যবসায়ী, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি হিসেবে বহুসংখ্যক মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি ছোট ছোট কাজ যেমন–ভাসমান শ্রমিক, গাড়োয়ান, মাঝি, হোটেলের কর্মচারী, বাবুর্চি, রঙের মিস্ত্রি, বাউয়ালী, মৃৎশিল্পী, বাঁশ-বেতের কাজ করা–এমন অনুল্লেখ্য পেশাসমূহকে অবলম্বন করেও ভাঙন-গড়নের মধ্যে দিয়ে জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ জীবন ধারণ করে চলেছে। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে প্রয়োজন। একটা সময় যা ছিল অপরিহার্য, যান্ত্রিক সভ্যতার নিগড়ে আধুনিকতার বেড়াজালে তেমন

[৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯
[৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

অনেক কিছুই হয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচলিত সামাজিক জীবনবিন্যাস রূপান্তরের পথ ধরে আধুনিক সময়ে এসে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। সামাজিক রূপান্তরের ক্রমপরিণতিই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে পেশাগত রূপান্তরের মাধ্যমে। সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক চাপে পেশাগত রূপান্তর চরম বাস্তবতা। একটা জনপদের সকল মানুষের সঞ্চরণশীল জীবনের বাঁকে বাঁকে যে নানা রঙ-রূপের খেলা তা *কিত্তনখোলা* নাটকে নাট্যকার স্বহৃদয়তার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।

কিত্তনখোলার মেলাতে লাউয়া সম্প্রদায়ের ছয়টা গহনা নৌকা এসেছে। লাউয়া রুস্তমের সঙ্গে কাশেমালির তাড়ির দোকানে সোনাইয়ের পরিচয় হয়। তার সঙ্গেই মৃগীরোগের ঔষুধ ভাল্লুকের নখ আনতে সোনাই এক সন্ধ্যায় ডালিমনের নৌকায় গেলে তা নিয়ে লাউয়াদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা লাউয়াদের নিজস্ব কিছু বিধিনিষেধ আছে। সন্ধ্যার পরে তারা নৌকায় যেমন ফিরতে পারে না, তেমনি বাইরের কেউ তাদের কাছে আসতে পারে না। সামষ্টিক জীবনে অভ্যস্ত লাউয়াদের জীবন গোষ্ঠীর নির্ধারিত নিয়মে বন্দি। সেখানে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সর্দার। সম্প্রদায়ের সবার উপরেই তার নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। আধিপত্যবাদী মানসিকতায় ডালিমনের মতো গোষ্ঠীর সব নারীও তার অধীন। সর্দারের একনায়কতান্ত্রিক আচরণের ও গোত্রের অভ্যন্তরীণ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে রুস্তম। হুকুম সর্দার বছর দুই আগে ডালিমনের 'জোয়ান খশম' রহমানকে খুন করে ডালিমনের শরীরের উপরে নিজের কর্তৃত্ব নিয়েছে। শারীরিক, মানসিক নানা অত্যাচারে ডালিমন এই সম্প্রদায় ছেড়ে পালাতে চায়। ডালিমনের সঙ্গে ভাব হয় সোনাইয়ের। অনুরাগে বাঁধা পড়ে দুজনের মন। কিন্তু তাদের ঘর বাঁধা সম্ভব না। জলের মেয়ে তো ডাঙায় ঘর বাঁধতে পারে না। এতে জলের নবী খোয়াজ খিজির বিরক্ত হবেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ থেকে গোষ্ঠীগত চেতনা ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মধ্যে প্রবল। নৌকার ছোট পরিসরের ভেতরেই এদের জন্ম-মৃত্যু। তাই শেষ পর্যন্ত সোনাই বা রুস্তমের কাছ থেকে ঘর বাঁধার আহ্বান পেলেও ডালিমন জল ছেড়ে ব্যক্তিগত রূপান্তরের পথ ধরে কোন নতুন সম্পর্কে নিজেকে জড়াতে পারে না। কিন্তু লাউয়া রুস্তম ব্যতিক্রম। সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করার পথে না গিয়ে সে ব্যক্তির নিজস্ব রূপান্তরের পথ ধরে মুক্তি খোঁজে। জাতিগত পরিচয় হারিয়ে ডালিমন বেঁচে থাকার কোন যুক্তি পায় না। তার স্পষ্ট উপলব্ধি– "তিরিশ নাও লাউয়া যদি তুফানে ডুবে–আমার একা বাঁইচা লাভ কি।"[১০] নিজেকে ভাঙা-গড়ার নিত্য খেলা মনকেও পরিবর্তন করে দেয়। ডালিমনের মানসিক রূপান্তর ঘটলেও জাতকেন্দ্রিক সংস্কারের জন্য সে আত্মপরিচয় বিসর্জন দিতে পারে না। পিতৃপুরুষের পেশা আঁকড়ে অত্যাচার সহ্য করে সামষ্টিক জীবনকেই নিয়তি মেনে বেঁচে থাকতে চায়।

নাটকে লাউয়াদের দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। এদের বিশ্বাস ইব্রাহীম নবীর অভিশাপের ফলেই লাউয়ারা অভিশপ্ত। জলে ভেসে চলা এই সম্প্রদায় ঘাটে ঘাটে, বন্দরে বন্দরে নৌকার নোঙর ফেলে। ডাঙায় সস্তা মনোহরি- কাঁচের রেশমি চুড়ি, ক্লিপ, ফিতা ও সে সঙ্গে কিছু তাবিজ-কবজ বিক্রির নামে লোক ঠকিয়ে যা আয় হয় তাই

[১০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

দিয়ে এদের দিন চলে। সে জীবনে সচ্ছলতা দূরে থাক নিত্য দিনের প্রয়োজনই মেটে না। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও পেশাগত রূপান্তরের বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হতে দেখা যায়। গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনায় বিশ্বাসী লাউয়ারা কর্ষণজীবি নয়- বরং যাযাবর। দুটো খেয়ে পরে বাঁচতে ওরাও কৃষিকাজের কথা ভাবে। "লউয়াগো বাঁচনের রাস্তা কেরমে কেরমে বন্ধ হইয়া যাইতাছে। মাছ ধইরা মনুহারি বেইচা আর দাঁতের পোকা ফালায়া পেডের ভাত যোগান বহুত কঠিন। চাষবাস না করলে আর বাঁচন নাই।"[১১] অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লাউয়ারা বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিচয়ের রূপান্তর ঘটিয়ে চাষা হতে চায়। আবার লাউয়াদের হুকুম সর্দার এরই মধ্যে সাপ ধরার কাজ শুরু করেছে বলে নাটকে রুস্তমের সংলাপে উল্লিখিত হয়েছে। "লাউয়ারা কি হাপুইড়া যে হাপ ধরব। ক দেহি ক–কত অনাচার আর সহ্য করুম।"[১২] পরবর্তীকালে রুস্তম নিজেও পেশাগত রূপান্তরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 'হাপুইড়া বাইদ্যা'য় রূপান্তরিত হয়ে লাউয়া জাত ত্যাগ করে। হুকুম সর্দারের কাছ থেকে 'দুইটা খরিশ–একটা শঙ্খচূড়' নিয়ে সে নৌকা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। নতুন জীবনের সন্ধানে রুস্তমের সঙ্গী হয় সোনাই। আবহমান কাল ধরে মানুষ এক জীবনের ভেতরে বহু জীবন যাপন করে চলেছে। এ যেন এক প্রবহমান নদী, ক্রমাগত ভাঙা-গড়ায় আর স্বপ্ন-সংগ্রামে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ধাবমান।

আলোচিত নাটকে এরই সমান্তরালে এসেছে 'নবযুগ অপেরা' যাত্রাদলের বনশ্রী বালা, ছায়ারঞ্জন, রবিদাশ- তিনজনের জন্য তিনজনের ভালোবাসার গল্প। গ্রামীণ সাধারণ পল্লীবালা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অসহায় শিকার যাত্রাদলের বনশ্রী বালা। রূপান্তরের নির্মম বাস্তবতা গ্রাম্য বালিকাকে বেশ্যার অন্ধকার জীবনে টেনে নিয়ে যায়। মানবিকতা বর্জিত সে জীবন ছেড়ে বনশ্রী একটু ভালোভাবে বাঁচতে প্রায় ছয় বছর আগে যাত্রাদলে যোগ দেয়। কিন্তু এখানেও শিল্পীর গৌরব তাকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে দেয় না। দৃশ্যত রূপান্তরের নির্মম অভিঘাতে সে হয়ে ওঠে যাত্রাদলের অভিনেত্রী। ঠিক তেমনি অপর দুজন কৃষকপুত্র রবিদাস ও ছায়ারঞ্জন– রূপান্তরিত জীবনে হয়েছে যাত্রাদলের অভিনেতা। রবিদাশের কাছে অভিনয়টা দেবতার পায়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়ার সমতুল্য। যাত্রার নেশায় তার সংসার ভেসে গেছে। আর ছায়া স্বাধীনতার সময়ে বাবা-মাকে হারায়। তখন সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ভালো নাচতে পারতো বলে সুবল ঘোষ ছায়াকে নিজের কাছে নিয়ে এসে বড় করে তুলেছে। সুবল ঘোষই তাকে নেশার জগতে ঢুকিয়েছে। এখন সে নেশা করে নিজের জীবনের কষ্ট ভুলতে চায়। রবিদাস ও ছায়া দুজনই বনশ্রীকে ভালোবাসে। এ ভালোবাসা সংঘাতের নয় সহমর্মিতার। তাই ইদু বনশ্রীর ঘরে যেতে, তার নাচ দেখতে চাইলে তারা যাত্রা দলের মালিক সুবল ঘোষের কাছে প্রতিবাদ জানায়– "বনশ্রী। তুমি ইদুর সামনে নাচতে পারবে না। ননীবালাও শ্যাষ রাইতে শফিক চেয়ারম্যানের ঘরে যাবে না।"[১৩] সমাজের অভ্যন্তরের অপ্রকাশিত সত্য– শিল্পী ও অধিকারীর দ্বন্দ্ব, লাউয়া সম্প্রদায়ের অন্তস্তলে বিরাজিত সর্দারের সঙ্গে সম্প্রদায়ের অন্যদের মানসিক বিভক্তি একই সমান্তরালে উন্মোচিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিপীড়িত হতে হতেও বনশ্রী নারীত্ব ও মাতৃত্বকে নিয়ে স্বপ্ন

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
[১৩] পূর্বোক্ত,পৃ. ১৫৪

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বোনে। ছয় বছর আগে যে রবিদাশ তাকে বেশ্যাপাড়া থেকে পুণ্যের পথের সন্ধান দিতে যাত্রাদলে এনেছিল সেই রবিদাশকে বনশ্রী ভালোবাসে। সে এ জীবন থেকে ফিরতে চায়, মাথায় সিঁদুর দিয়ে সংসারধর্মে মন দিতে চায়। নারীমননের অন্যন্য রূপায়ণ বনশ্রী। তার মুখ দিয়েই নাট্যকার উচ্চারণ করিয়েছেন মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শন, "মন বদলাতে হলে রূপটাও বদলাতে হয়।"[১৪] বাহ্যিকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয় মন। তাই পারিপার্শিক রূপান্তরের প্রভাবে অলক্ষ্যে ঘটে যায় মানসিক রূপান্তর। বনশ্রী ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনকে আলিঙ্গন করতে উৎসুক। কিন্তু সমাজ এখানে বড় বাধা। তবে দলের অধিকারী সুবল ঘোষের নির্লজ্জ লোভ বনশ্রীকে বারবার পুরোনো সেই পাপের পথেই টেনে নিয়ে যায়। সুবল ঘোষের কথা মত না চললে দলটা ভেঙে যাবে। হাহাকারের মতো বনশ্রীর গলায় বেজে ওঠে, "দল ভাঙলে আমি কোথায় যাবো।"[১৫] আগের বছরও সুবল ঘোষ নাগরপুরের দুই মেম্বারের কাছে বনশ্রীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুই দিন থাকতে বাধ্য করেছিল। এবছরও ইদুকে খুশি করতে বনশ্রীকে নাচতে বাধ্য করে। বনশ্রী, রবিদাস, ছায়ার বেঁচে থাকার অবলম্বন এই যাত্রা দল আর সুবল ঘোষের কাছে ব্যবসা। অবশ্য সমাজের ক্ষমতাশীলদের তুষ্ট না রাখলে যাত্রাদল টিকিয়ে রাখা কঠিন। ফি বছর বাইনা পেতে দলের নারীদের পণ্যের মতোই ব্যবহার করা হয়। নাট্যকার নিজেই বলেছেন, "বনশ্রী বালার মধ্যে আমি এক ডোম নারীর জীবন ও শিল্পচেতনার একত্রীভূত চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।"[১৬] জীবনভর নানা যন্ত্রণায় সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মনসার সমান্তরাল হয়ে উঠেছে। মঞ্চের উপর যে অভিনেত্রী দর্শকের বাহবা কুড়াই মঞ্চের পেছনে থাকে তার অন্য জীবন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর আলাদা সত্তাকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্থ। সব লালসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে শেষ রাতে 'এণ্ডিন' খেয়ে আত্মহত্যা করে বনশ্রী। সন্ধ্যেবেলায় নদীর ঢালুতে সুন্দি বনের ধারে আম গাছ কেটে মৃতদেহ পোড়ানো হয়। দাউ দাউ লাল আগুনের মধ্যে আস্ত নারী শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। এই নৃত্য জীবন্ত মানুষের সামনে কোন নৃত্যরত রমনীর নয়। হাসিখুশি বনশ্রীকে কেন্দ্র করে ছয় বছর আগে যে নয়াযুগ অপেরার জন্ম হয়েছিল সেই অভিনেত্রীর মৃত্যু যেন যাত্রাদলটাকের নতুন বাঁকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। মনসার চরিত্রে অভিনয় করাটা যার স্বপ্নে ছিল সেই অভিনেত্রী বনশ্রী বালার রূপান্তর ঘটে তাজা আম কাঠের পোড়া গন্ধে। কাঁচা কাঠের সঙ্গে মিশে যায় মাংসের পোড়া গন্ধ। চিতা নিভলে ছাইয়ের মধ্যে পড়ে থাকে বনশ্রীর নাভি। অন্যদিকে বনশ্রী, ছায়া ও রবিদাশকে ছাড়াই মেলার প্যান্ডেলে যাত্রাপালা চলতে থাকে। কোথাও কিছু কারো জন্য অপেক্ষায় থাকে না।

বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্ত সর্বস্তরের সকল মানুষের জীবনসংগ্রাম ও অস্তিত্বের লড়ায়ের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত *কিত্তনখোলা*। সমাজের অভ্যন্তরের মানসিক টানাপড়েন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, আনন্দ, অন্তরদহন সর্ন্তোপনে অবস্থান্তর ঘটিয়ে সামাজিক রূপান্তর ত্বরান্বিত করছে। হতদরিদ্র ইদল হক তেমনই এক চরিত্র। সে পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরজাত সৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়। সেই সময়ে ইদু মানিকগঞ্জ অঞ্চলে মায়ের সঙ্গে বাস করত। তার মা

[১৪] পূর্বোক্ত,পৃ. ১১৯
[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০
[১৬] পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৮

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

নিজে অনাহারে থেকে ইদুকে কোনমতে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে। টানা সাত দিন অভুক্ত থাকার পরে মণ্ডল বাড়িতে তার মা খিচুড়ি খেয়ে মারা যায়। এরপর ইদু পেটে-ভাতে হুরমত কাজির বাড়িতে কাজ শুরু করে। সেখানে একবেলা ভাত আর দুই বেলা ভাতের ফেন পেত সে। দুইশ মনের ধানের বস্তা আর নয় দশটা গরু ইদুকে সেই কৈশোরেই সামাল দিতে হতো। ইদু অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই ইদল হক হয়ে উঠেছে। সে বিবেচনায় ইদুও সমাজের ক্ষমতাবানদের শ্রেণী বৈষম্যের এক অসহায় শিকার। পীড়িত-নিপীড়িতের স্বভাবগত রূপান্তরের ফলশ্রুতিতে একসময় ইদু সমাজের অন্যতম চালকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। নাটকে ইদু পেশায় কন্ট্রাক্টর। নাট্যকারের মতে-"চলতি অর্থে ইদুকে ভিলেন বললেও আসলে সে তা নয়। সে প্রকৃতিজাত এবং সর্পতুল্য। এই সংস্কৃতির মধ্যেই সে শিকার ও শিকারীর যুক্তি খুঁজে পায়। অকাল খরা–ঝড়–বৃষ্টি তাকে শোষণের অসীম ক্ষমতা যোগায়।"[১৭] কোন পথে ইদু হতদরিদ্র অবস্থা থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে তা সহজেই অনুমেয়। বলাইবাহুল্য পেশাগত জীবনে সে অসৎ। আর্থ-সামজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইদুদের ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধাবাদীদের দলে ভিড়ে জবর দখল, ভূমি ও অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, কালোবাজারি, উচ্ছেদের ঘৃণ্য পথে ইদু পেশার রূপান্তর ঘটিয়ে হয়ে উঠেছে 'কনটাকটর ইদল হক'। তার আচরণে ও সংলাপে ধূর্ততার বহি:প্রকাশ স্পষ্ট। মেলাতেই শোষক ইদু সম্পূর্ণ গ্রাস করতে চায় সোনাইয়ের শেষ সম্ভল জমিটুকু। প্রকারান্তরে পুরো গ্রামকেই যেন সে গ্রাস করতে উদ্ধত। মালেক, ওদ্দার মতো কিছু মানুষকে সে টাকা দিয়ে পোষে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী মাত্রই তার কাছে ভোগ্যবস্তু। হুরমত কাজীর বাড়ির মেয়েদের সৌন্দর্য বর্ণনাকালে যে ভাষা সে ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত নিম্নরুচির পরিচায়ক। "সোন্দর সোন্দর মাইয়াগুলান, ত্যালে থপ থপ করে"[১৮]–মেয়েদের সম্পর্কে অশ্লিল ও কুরুচিকর মন্তব্য থেকে ইদুর মনোজগতের নোংরা ভাবনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আবার যাত্রাদলের মেয়ে বনশ্রীর দিকেও সে কামনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিশুকাল থেকে তার বেড়ে ওঠা ও সামাজিক উত্তরণের দিকে মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে যে উন্নত রুচি, সুস্থ জীবনবোধ, মানবিকতা, শিক্ষা, সহানুভূতি তার মানসগঠনে অনুপস্থিত। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে একসময় যে অত্যাচার, অবহেলা সে সহ্য করেছে তা তাকে নৈতিকভাবে পরিপুষ্টি দিতে অসমর্থ ছিল। পারিপার্শিক পরিস্থিতি তাকে অন্যের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়ার শিক্ষাই দিয়েছে। সোনাইয়ের মতো সব মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে তাদের শেষ সম্বল কেড়ে নেওয়াতেই ইদুর সন্তুষ্টি। আবার সুবোল ঘোষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বনশ্রীকে ভোগ করাতে চাওয়াও প্রকারান্তরে ইদুর ক্ষমতা প্রদর্শন। বনশ্রী তার সামনে নাচতে রাজি না এমন খবর পেয়ে সে সুবল ঘোষের কাছে নিজেকে চরিত্রবান দাবী করে। তবে ইদু জানায় কন্ট্রাক্টরির কাজে ব্যক্তিগত চরিত্র অনেক সময় সার্বিক পরিস্থিতির জন্য অভিযুক্ত হয়ে থাকে। দৌলতপুরে আঠারো ফুট রাস্তা লাখ টাকা দিয়ে ইদু তৈরী করলেও অকাল বৃষ্টিতে সেই রাস্তা আট ফুট হয়ে যায়। ইদুর এ সবই ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে নিজেকে নির্দোষ দাবীর একটা অকেজো বাহানা মাত্র। বনশ্রী তার সামনে স্বেচ্ছায় নাচতে চায়নি, মনের বিরুদ্ধে দল

[১৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭
[১৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

রক্ষার জন্য সে মদ্যপ হয়ে নাচতে বাধ্য হয়েছে। নাচ দেখে পঞ্চাশ টাকা বকশিস দিয়েছে ইদু, তবে সে সন্ধ্যায় আবার বনশ্রীর ঘরে যাবে বলে জানায়। "এখন নাচ দেখছি, পঞ্চাশ টাকা দিছি। ছোঁওনের পয়সা না–দেখনের পয়সা। নদীর কূলে বইসা নদী দেখলে পয়সা লাগে না। গুদারায় গেলে লাগে।"[১৯] যাত্রাদলের নারী হয়েও বনশ্রী নিরাপদ জীবন প্রত্যাশী। গ্রাম বাংলার সাধারণ সমাজ ব্যবস্থায় ইদুর মতো মানুষ বারবারই নারীমাংসের গন্ধে বনশ্রীদের রক্তাক্ত করে তোলে। প্রকারান্তরে ইদুর প্রতি অতিষ্ট হয়ে বনশ্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেও ইদু নির্বিকার। বনশ্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে সে ঘিওরকুলের সাপে কেটে মারা যাওয়া রওশন নামের একটা মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করে আসল ঘটনা আড়াল করতে চেষ্টা করে। "ইদু যেন তার জন্মান্তরের রূপান্তরিত অসুর"[২০]– বলে উল্লেখ করেছেন নাট্যকার। কিন্তু এদেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ইদু পৌরাণিক অসুরের থেকেও ভয়ংকর, ধূর্ততা ও নৃশংসতায় অপ্রতিরোধ্য। সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রূপবদল করে সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার উৎসে থাকতে ইদুর মতো চরিত্ররা সব সময় সিদ্ধহস্ত।

গ্রাম বাংলার চিরপরিচিত দৃশ্য কবির লড়াই ও 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' গীত নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মেলাতে দেখা পাওয়া যায় শামছল বয়াতি, তার শিষ্য পুত্রসমতুল্য মংলা ও পুথি পাঠকারী খালেক মাঝির। সোনাই নিজেও একসময় যখন জমিতে চাষ করতো, বউ চম্পা বেঁচেছিল তখন প্রতি রাতে পুথি পড়তো। সেদিন কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রাকৃতিক রূপান্তরে সোনাই জমি, বউ হারিয়ে ইদুকে খুন করে দেশান্তরী হয়ে যায়। কোন এক দুখাইপুরে নতুন পরিচয়ে রূপান্তরিত জীবন সংগ্রাম হয়তো সোনাইয়ের জন্য অপেক্ষমান। নাটকে প্রাকৃতিক রূপান্তরের আরেক অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে শামছল বয়াতি ও হাশেম খানের কবির লড়াইয়ের আসরে। বর্ষিয়ান শামছল বয়াতি আলাওলের পদ্মাবতীর কাকুনুস পঙ্গীর সওয়াল কবিগানে উদ্ধৃত করেন।

"শামছল। সেই না পঙ্খীর জাহেরি নাম হয় গো কাকুনুস।

দোহার। সেই না পঙ্খীর–ইত্যাদি।

শামছল। বাতুনিতে সেই না পঙ্খী নাম হছে তার মানুষ।

দোহার। বাতুনিতে সেই না–ইত্যাদি।

শামছল। আগুন হচে মরণ তাহার ডিম হচে তার বংশ।"[২১]

প্রকৃতিতে কোন রূপই চিরন্তন নয়। একটার শেষে অন্যটার শুরু। রূপ বদলের অমোষ ধারাক্রমই কাকুনুস পাখির প্রতীকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। কবির লড়াইয়ে কাকুনুস পঙ্খীর প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে সোনাইয়ের মনে হয়-"কুনটা সাঁচা–বাঁচন না মরণ।"[২২] তার উপলব্ধি হয় "দুইন্যায় রূপ বদলটাই আসল কতা।–গোরস্থানে তালগাছের হিকর যেই রস টানে– সেটা

[১৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
[২০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
[২১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
[২২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

আসে ডাবের মদ্যি।–মাটির নিচে গেঁজায়া তা হয় তাড়ি।"[২৩] আবহমান কাল ধরে পৃথিবীর বুকে মাটির নিচে কতনা মানুষের শরীর মিশে গিয়েছে। প্রাচীন সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত যত স্থান চিতা বা কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে তার সবই তো নির্ধারিত নেই। অনির্ণীত চিতা বা গোরস্থানের উপরে পরবর্তী সময়ের রূপান্তরিত জীবন স্বাচ্ছন্দে আন্দোলিত হয়, তৈরী হয় নতুন জনপদ, গজিয়ে ওঠে ফলজ বা বনজ কতনা গাছ, নতুন দম্পতির সংসার। অর্থাৎ সমকালীন জীবিতেরা পূর্বপুরুষের মৃতদেহের উপরে যাপিত জীবনের যাবতীয় হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। কাশেমালির তাড়ির দোকানে তাড়ি খেতে খেতে এই রূপ পরিবর্তনের বিষয়টা আরো একবার সোনাইয়ের মনে হয়। তালের রস তো আসে মাটির নিচ থেকে। গোরস্থানের উপরে যে তাল গাছ, সে তো মাটির নিচে কবরে শোয়া মৃতদেহ থেকে রস টেনে বেড়ে ওঠে। অনির্ধারিত স্থানে নদীর ঢালে যেখানে বনশ্রী বালার চিতা সাজানো হয়, সেখানে পোড়া শরীরের ছাই থেকে কোন এক আষাঢ়-ভাদ্রে হয়ত তাল গাছের জন্ম হবে। "নারী ও ফলবান"। সেই রসেও কারো কারো নেশা হবে অন্য কোন মেলায়। হয়ত নতুন কোন সোনাই, ছায়া বা রুস্তম নতুন জীবন নাটকে সামিল হবে। অন্যদিকে মানসিক রূপান্তরের ক্রমপরিণতিতে ডালিমন ও সোনাইয়ের মধ্যে যে হৃদয়জ অনুভূতির জন্ম হয় তারও কোন বাস্তবিক রূপ দেওয়া তাদের জন্য সম্ভব হয় না। ডালিমনের স্মৃতিতে সময়ের পরিক্রমায় সোনাই নামের মানুষটা একসময় ঝাপসা হয়ে আসবে। ডালিমনের যাপিত জীবনে হয়ত আরো অনেক সোনাইয়ের আর্বিভাব ঘটবে। ঠিক একই ভাবে ঘূর্ণাবর্তে পরিবর্তিত হবে সোনাইয়ের জীবন। একপর্যায়ে মানুষ ও প্রকৃতির এই রূপান্তর সোনাইয়ের কাছে মনে হয়েছে "অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য।"[২৪]

সামাজিক শোষণযন্ত্র জনসাধারণের উপর যে অদৃশ্য অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত রূপান্তরের প্রকৃয়াকে ত্বরান্বিত করে চলেছে তারই রেখাচিত্র *কিত্তনখোলা*। এছাড়াও বনশ্রীবালার মৃত্যু-পরবর্তীসময়ে সৎকারের বর্ণনায় প্রাকৃতিক রূপান্তরের অন্যভূবন এ নাটকে উন্মোচিত হয়েছে। জীবনের বহুমাত্রিকতায় বাঁক বদলের শাখে শাখে সামাজিকগণের মনে বুদবুদের মতো ফেনায়িত হয়ে ওঠা প্রশ্ন বনশ্রীর কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে ওঠে, –"জীবন কিসের নাম।"[২৫] বনশ্রীর মনে হয়েছে জীবনটা আমলকির মতো, "এট্টা ফলের মদ্যি এত রঙের সোয়াদ ক্যান। কষটা লাগে–চুকা লাগে–নোনতাও লাগে–বেশি চাবাতি গেলে তিতা–"[২৬] জন্মপরবর্তীকাল থেকেই মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চূড়ান্তভাবে পেশাগত রূপান্তরের নানা রঙে আন্দোলিত হয় এক একটা মানব জীবন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি ও তার অভ্যন্তরের সকল সৃষ্টিই প্রতিমুহূর্তেই সঞ্জাত করে নব নব সম্ভাবনা। নাট্যকার নিজেও জীবন নাট্যের সেই অচিন পালাকারের সন্ধান করেছেন *কিত্তনখোলাতে*। জীবনভর রূপান্তরের খেলায় কেউ চলেছে সামাজিক রূপান্তরের পথ ধরে, কেউ বা পেশাগত রূপান্তর ঘটিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে, অথবা কারো কারো মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অনিবার্য রূপান্তরের দিকে অভিযাত্রা। "চাঁদও রূপান্তরিত হয় প্রতিদিন কলায় কলায়, নদী নিরন্তর সঞ্চরণশীল। তারও আছে জোয়ার-ভাঁটা, চর, ভাঙাকূল– প্লাবন

[২৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
[২৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
[২৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
[২৬] পূর্বোক্ত, পৃ.১২১

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ও শীর্ণতা। এই তেতো লবণাক্ত জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষের জন্য অপেক্ষা করে রূপান্তর।"[২৭] মানুষ ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ। তাই প্রকৃতিগত রূপান্তরের পাশাপাশি সামাজিক ও পেশাগত রূপান্তর মহাকালের হিসেবে চিরন্তন সত্য হিসেবে টিকে থাকে। জীব ও জড় জগতের অভ্যন্তরীন এ খেলায় যেন অপরিহার্য্য দর্শন- "এক জনমে কত বদল কত টেক"।[২৮]

তথ্য-নিদের্শঃ

১। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ২, সংকলন সাইমন জাকারিয়া, মওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৬, পৃ. ভূমিকা
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
৪। পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩৩
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪
১৩ । পূর্বোক্ত,পৃ. ১১৯
১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০
১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮
১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭
১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
২৫। পূর্বোক্ত, পৃ.১২১
২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫
২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

[২৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫
[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay